বিশেষ ক্রোড়পত্র

মহান বিজয় দিবস

সোমবার ১৬ ডিসেম্বর ২০১৯

১৬ ডিসেম্বর...

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পর)

বিদেশিদের শাসনমুক্ত হতে হবে। বাঙালিরাও এই আন্দোলনে সামনের কাতারে থেকে সংগ্রাম করেছিল। বাঙালি মুসলমানরা ভারতবর্ষের পূর্বাংশে তাঁদের জন্য একটি পৃথক আবাসভূমির জন্য লড়াই সংগ্রাম করেছে। এক পর্যায়ে তাঁরা পাকিস্তান ধারণাকেও মেনে নিয়েছিল এই বিশ্বাসে যে পাকিস্তান সৃষ্টি হলে তাদের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার নিশ্চয়তা মিলবে। এই আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিম, শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক প্রমুখ। তাঁদের সাথে কর্মী হিসেবে নিরলস পরিশ্রম করেছেন কলকাতায় অধ্যয়নরত তরুণ শেখ মুজিবসহ অনেকে।

১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে ভারতবর্ষ ভাগ হয়ে পাকিস্তান ও ভারত নামের দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হলে পূর্ববঙ্গের বাঙালিরা পূর্ব পাকিস্তানের অংশ হয়ে যায়। তারা একটি স্বাধীন দেশের মর্যাদা নিয়ে পূর্ববঙ্গে বসবাস করবে সেটি তাদের স্বপ্ন ছিল। তবে বাঙালির সেই স্বপ্ন ভঙ্গ হতে বেশিদিন লাগেনি। পাকিস্তান সৃষ্টির শুরু হতেই বাঙালি বাস্তবে হয়ে গেল পশ্চিম পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠীর প্রজা আর পূর্ববঙ্গ হয়ে উঠলো পশ্চিম পাকিস্তানের একটি উপনিবেশ। শুধু ইংরেজ শাসকদের পরিবর্তে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসনের প্রতিষ্ঠা হলো। আবার শুরু হলো বাঙালির আত্মনিয়ন্ত্রণ ও মুক্তির আন্দোলন, আবার সংগ্রাম। এবারের সে সংগ্রাম অনেকটা আওয়ামী লীগের একক নেতৃত্বে। অখণ্ড পাকিস্তানের তেইশ বছরের সে সংগ্রামের নেতৃত্বে ছিলেন মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৬৩ সালে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যু হয়। মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী আওয়ামী লীগ হতে বের হয়ে যান। বাঙালির মুক্তির লক্ষ্য অর্জনের দায়িত্বটা এসে পড়ে বঙ্গবন্ধুর উপর। বঙ্গবন্ধু অখণ্ড পাকিস্তানের তেইশ বছরের তেরো বছর কারাগারে কাটিয়েছেন। মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছেন দু'বার। অবশেষে সত্তরের নির্বাচন, আওয়ামী লীগের ধস নামানো বিজয়, পাকিস্তানের সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্রের আওয়ামী লীগ তথা বঙ্গবন্ধুর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করার ষড়যন্ত্র, তারপর বাঙালির মহান মুক্তিযুদ্ধ যার পরিণতি ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়।

বঙ্গবন্ধু আজীবন একটি অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক, স্বয়ংসম্পূর্ণ, দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতা মুক্ত বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছেন। কিন্তু তাঁর সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের পূর্বেই স্বাধীনতার শত্রুরা তাঁকে হত্যা করে। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর দীর্ঘ একুশ বছর বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ শুধু ক্ষমতার বাইরেই থাকেনি, কখনো কখনো অস্তিত্বের সংকটে পড়েছে। কিন্তু দলটির এক ঝাঁক নিবেদিত কর্মীর প্রচেষ্টায় আবার উঠে দাঁড়িয়েছে। ১৯৮১ সালের মে মাসে ছয় বছরের নির্বাসিত জীবন শেষে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা দৃঢ়তার সাথে দলটির হাল ধরেন। ১৯৯৬ সালে সরকার গঠনের পর অনেকে ধারণা করেছিলেন রাষ্ট্র পরিচালনায় একজন অনভিজ্ঞ শেখ হাসিনা তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব হয়তো সঠিকভাবে পালন করতে পারবেন না। রাষ্ট্র পরিচালনায় শেখ হাসিনার অভিজ্ঞতা না থাকতে পারে কিন্তু ধমনিতেতো বঙ্গবন্ধুর রক্ত। পিতার রাজনৈতিক জীবনের একজন সাক্ষী, নিজে পরিচ্ছন্ন ছাত্র রাজনীতি করেছেন, পিতার মতো সাহস আর জেদ আছে, নির্ভয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, চলার পথে বাধা অতিক্রম করার মন্ত্র জানেন, তাঁকে রুখে কে ? তাঁর হাত ধরেই ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশের নব উত্থান। জন্মের পর যে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ দেখার মানুষ পাওয়া দুরূহ ছিল সেই বাংলাদেশের মানুষ ৪৯তম বিজয় দিবসে বলতে পারে 'আমিই বাংলাদেশ'। যে দেশ স্বাধীন করার জন্য ত্রিশ লক্ষ মানুষ অকাতরে নিজের জীবন উৎসর্গ করতে পারে সেই দেশতো কখনো পরাজিত হতে পারে না। ১৯৭১-৭২ সালে অনেকের কাছে একটি নিষ্প্রভ বাংলাদেশ এখন সারা বিশ্বে একটি সম্মানিত রাষ্ট্র আর সেই রাষ্ট্রের বর্তমান ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডার, রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা। যে জাতি অন্যের দেওয়া রিলিফ খেয়ে যাত্রা শুরু করেছিল সে জাতি অন্যকে সংকটের সময় এখন রিলিফ দিতে পারে। শুরুতে বাংলাদেশের বাজেট ছিল ৭৮৬ কোটি টাকা। চলতি অর্থবছরে তা বৃদ্ধি পেয়ে পাঁচ লক্ষ তেইশ হাজার কোটি টাকা হয়েছে। যাত্রার শুরুতে পুরো বাজেটই ছিল সাহায্য নির্ভর। বর্তমানে মোট রাজস্ব বাজেটের নব্বই ভাগ নিজেদের অর্থে বাস্তবায়িত হয়। বাকি আট ভাগ আসে বৈদেশিক ঋণ আর দুই ভাগ সাহায্য হতে। একটি খাদ্য ঘাটতির দেশ এখন খাদ্য উদ্বৃত্তের দেশে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশের উন্নয়ন দেখে শুধু বিশ্ব অবাকই হয় না, অনেকে বলে বাংলাদেশ বর্তমানে একটি রহস্যময় অর্থনীতির (Mysterious Economy) দেশ। চলতি অর্থবছরে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার এই অঞ্চলে সর্বোচ্চ, ৮.১৩। ২০৩০ সাল নাগাদ বাংলাদেশ বিশ্বে ২৪তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ হওয়ার স্বপ্ন দেখছে। স্বাধীনতার আগে যে বাংলাদেশকে পাকিস্তানিরা অবজ্ঞার চোখে দেখতো, সেই পাকিস্তান এখন বাংলাদেশ হতে চায়। তাঁরা চিৎকার করে বলে 'আমাদের বাংলাদেশ বানিয়ে দাও'। বিশ্বের নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানিয়ে তাঁর কাছে উন্নয়নের রহস্য জানতে চায়। বঙ্গবন্ধু হয়তো আকাশ ছুঁতে চেয়েছিলেন, ঘাতকরা তা হতে দেয়নি। তাঁর কন্যার হাত ধরে এদেশের মানুষ কিছুটা হলেও আকাশের কাছাকাছি পৌছাতে পেরেছেন। এই বিজয় দিবসে সকলকে বিজয়ের শুভেচ্ছা। একাত্তরের মহানায়কদের অভিবাদন। ❑

লেখক: সাবেক চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন

বিজয় দিবসের...

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পর)

গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের অবদমন ও জঙ্গিবাদ।

বঙ্গবন্ধু জীবনে তিনটি বিজয় দিবস উদ্‌যাপনের সুযোগ পেয়েছিলেন। বিজয় দিবসসমূহে কী ভাবতেন বঙ্গবন্ধু?

দিনটি ছিল ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর শনিবার। সেদিন অপরাহ্নে ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বিশাল জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধু যে ভাষণ দিয়েছিলেন তা থেকে বাঙালি জাতি এক নতুন বার্তা পেয়েছিলেন। বাহাত্তরের ১৬ ডিসেম্বর, বিজয় অর্জনের প্রথম বার্ষিকীতে বঙ্গবন্ধুর ভাষণে বাঙালি পেয়েছিল নতুন পথের সন্ধান, নতুন জীবন গড়ার প্রত্যয় ও যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে সোনার বাংলায় রূপান্তরের প্রত্যাশা। তিনি সেদিনের ভাষণে ঘোষণা করেন যে, "আজ (১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২) থেকে বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকর হয়েছে এবং পাকিস্তান আমলের সব কালাকানুন বাতিল করা হয়েছে"। তিনি বলেন যে, "সমগ্র বাঙালি জাতি এতদিন যে অধিকার অর্জনের জন্য নিরলস সংগ্রাম করেছে সেই অধিকারের দলিল সংবিধান মানুষ পেয়েছে"। জনতার মুহুর্মুহু করতালির মধ্যে বঙ্গবন্ধু সেদিন ঘোষণা করেন যে, "পাকিস্তান আমলে সৃষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্সসহ সকল কালাকানুন আজ থেকে বাতিল হয়ে গেল"।

পাকিস্তানের স্বীকৃতি প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু সেদিন এক পর্যায়ে বলেন, "পাকিস্তান বলে কোনো পদার্থ নেই। কারণ আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলাম। আমরাই স্বাধীনতা ঘোষণা করে বেরিয়ে এসেছি। এখন কাকে স্বীকৃতি দান করব? পাকিস্তান, বেলুচিস্তান, সিন্ধুস্তান না পাঠানিস্তানকে"।

পরের বছর অর্থাৎ ১৯৭৩ সালের মহান বিজয় দিবসের প্রাক্কালে ১৫ ডিসেম্বর শনিবার সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশে বেতার ও টেলিভিশন ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন, "ষোলই ডিসেম্বরের সঙ্গে আমাদের অনেক ব্যথা, বেদনা, আনন্দ, গৌরব এবং আশা আকাঙ্ক্ষা জড়িত। এই দিন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে প্রায় এক লাখ পরাজিত শত্রু আত্মসমর্পন করেছে। কিন্তু আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে আরো শক্তিশালী শত্রু। এই শত্রু হলো অভাব, দারিদ্র্য, ক্ষুধা, রোগ, অশিক্ষা, বেকারত্ব ও দুর্নীতি। এই যুদ্ধে জয় সহজ নয়। অবিরাম যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে এবং একটি সুখী, সুন্দর, অভাবমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হবে। তবেই হবে আমাদের সংগ্রাম সফল। আপনাদের শেখ মুজিবুরের স্বপ্ন ও সাধনার সমাপ্তি"।

জীবদ্দশায় শেষ বিজয় দিবসের প্রাক্কালে ১৫ ডিসেম্বর ১৯৭৪ রবিবার সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশে বেতার ও টেলিভিশনে দেওয়া ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন, "একটি কথা ভুলে গেলে চলবে না। চরিত্রের পরিবর্তন না হলে অভাগা দেশের ভাগ্য ফেরানো যাবে কিনা সন্দেহ"।

"স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি ও আত্মপ্রবঞ্চনার উর্ধ্বে উঠে আমাদের সকলকে আত্মসমালোচনা, আত্মসংযম এবং আত্মশুদ্ধি করতে হবে। মনে রাখতে হবে, আপনি আপনার কর্তব্য দেশের ও দেশের জনগণের প্রতি কতটা পালন করছেন সেটাই বড় কথা"- বলেছিলেন বঙ্গবন্ধু।

সেদিনের সে ভাষণে তিনি আরো বলেছিলেন যে, "বাংলাদেশ আজ তিনটি মহাবিপদ তথা তিন শত্রুর মোকাবেলা করছে। (১) মুদ্রাস্ফীতি যা আজ সারা বিশ্বে ভয়াবহ আকারে দেখা দিয়েছে, (২) প্রাকৃতিক বিপর্যয় তথা বন্যা এবং (৩) চোরাকারবারী, মুনাফাবাজ, মজুতদার ও ঘুষখোর। এই তিন শত্রুর বিরুদ্ধে সরকারকে সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়েছে নতুন প্রতিরোধ সংগ্রামে"।

দুর্নীতিবাজ, মুনাফাবাজ, মজুতদার ও কালোবাজারিদের প্রতি কঠোর সতর্ক বাণী উচ্চারণ করে বঙ্গবন্ধু বলেন, "এই সব নরপশুদের উৎখাতে আমি আপনাদের সাহায্য ও সহযোগিতা চাই"। এই ভাষণে তিনি আরো বলেছিলেন, "বাংলার মাটিতে সাম্প্রদায়িকতার কোন স্থান নেই। মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান বাংলাদেশে যারা বসবাস করেন তাঁরা সকলেই এদেশের নাগরিক। তাঁরা সমঅধিকার ভোগ করবেন"।

ষড়যন্ত্রকারীদের একাত্তরের চেতনা বিনাশের লক্ষ্য সফল হয়নি। নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরেই মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার স্বপ্ন পুনরুজ্জীবিত হয়েছে। সম্পন্ন হয়েছে যুদ্ধাপরাধী ও জাতির পিতার হত্যাকারীদের বিচার। বর্তমান সরকার ২০০৯ সালে ক্ষমতা গ্রহণের পর 'ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা' গড়ার প্রত্যয়ে 'রূপকল্প-২০২১' প্রণয়ন করেছে। একইসঙ্গে বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত করার সংকল্প স্থির করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ সমৃদ্ধ ও উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার পথে দ্রুত অগ্রসরমান। ভৌত অবকাঠামো, যোগাযোগ, তথ্যপ্রযুক্তি, পরিবেশবান্ধব জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ, সমুদ্র ব্যবস্থাপনা, মহাকাশ গবেষণা, সুশাসন ও গণতন্ত্র এবং সর্বোপরি শিল্প ও গবেষণাসহ উন্নয়নের সকল ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাফল্য বিস্ময়কর।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতায় বাংলাদেশের অর্থনীতি দৃঢ়তার সঙ্গে বৈশ্বিক ও অভ্যন্তরীণ সংকট মোকাবিলা করে প্রবৃদ্ধির ধারাবাহিকতা ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিসহ আর্থসামাজিক প্রতিটি সূচকে এগিয়েছে বাংলাদেশ। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জিডিপি-র প্রবৃদ্ধি ৭.২৮ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৮.১৩ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। মাথাপিছু আয় বর্তমানে ১৯০৯ মার্কিন ডলার। বিশ্বব্যাংকের রিপোর্ট অনুযায়ী সামাজিক খাতের অগ্রগতিতে বাংলাদেশ অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভারত ও পাকিস্তানের তুলনায় এগিয়ে রয়েছে। নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের ভাষ্যেও এ তথ্যের প্রতিফলন পাওয়া যায়, 'সামাজিক-অর্থনৈতিক সব ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পাকিস্তান থেকে এগিয়ে। এমনকি সামাজিক কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভারত থেকেও এগিয়ে।' নারীর ক্ষমতায়নের সূচক বৃদ্ধি পেয়ে ৩৬.৩ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। এ সরকারের দুই মেয়াদে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২০ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে উৎপাদন শুরু হলে আরও দুই হাজার ৪০০ মেগাওয়াট যোগ হবে।

তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে এসেছে অভূতপূর্ব সাফল্য। বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন আজ বাস্তবে দৃশ্যমান। দেশে মোবাইল ব্যবহারকারী বর্তমানে ১৫২.৬ মিলিয়ন, যেখানে ২০০৬ সালে এ সংখ্যা ছিল ১৯.১ মিলিয়ন। বর্তমানে দেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারী ৮৮.৭ মিলিয়ন। মহাশূন্যে 'বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট' উৎক্ষেপণের মাধ্যমে প্রযুক্তিগত সক্ষমতার নতুন দিগন্তে প্রবেশ করেছে বাংলাদেশ।

অবকাঠামো উন্নয়ন ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় অর্জিত হয়েছে দৃশ্যমান অগ্রগতি। এছাড়া পদ্মাসেতু, কর্ণফুলি টানেল, গভীর সমুদ্রবন্দর, নগরে মেট্রোরেল ও পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রসহ চলমান প্রকল্পসমূহ সুসম্পন্ন হলে বাংলাদেশ উন্নত দেশে পরিণত হতে পারবে নিঃসন্দেহে। যে প্রত্যয় নিয়ে মানুষ মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল আজ মানুষ সে প্রত্যয় প্রত্যক্ষ করেন শেখ হাসিনার মধ্যে। বঙ্গবন্ধু যেমন আত্মপ্রত্যয়, সাহস ও শক্তি যুগিয়েছিলেন সাড়ে সাত কোটি বাঙালির মধ্যে, আজ শেখ হাসিনা তেমনি ১৬ কোটি বাঙালির আত্মপ্রত্যয়ের প্রতীক হয়ে উঠেছেন।

জাতির পিতার আরাধ্য কর্মপ্রয়াস ছিল দুটি–স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা ও বাংলাদেশকে সোনার বাংলায় পরিণত করা। তিনিই প্রথম স্বপ্ন পূরণের অগ্রনায়ক। দ্বিতীয়টি বাস্তবায়নের জন্য হাল ধরেছেন বঙ্গবন্ধুর কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তাঁর দূরদর্শী ও কৌশলী নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল। বহির্বিশ্বে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আজ একজন সফল রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে স্বীকৃত। বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের অংশগ্রহণ, নারীর ক্ষমতায়ন, পৃথিবীর অস্তিত্ব রক্ষায় বিশ্ব সমাজের করণীয় নির্ধারণ ও বৈষম্যহীন শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠায় তাঁর অঙ্গীকার আজ বিশ্বে প্রশংসিত। মানুষের প্রতি দরদ, ভালোবাসা তাঁকে মহিমান্বিত করেছে। বিশ্ববাসী আজ বাংলাদেশের মানুষের শেষ আশ্রয়স্থল, জননেত্রী শেখ হাসিনাকে 'চ্যাম্পিয়ন অব দ্যা আর্থ' ও 'মাদার অব হিউম্যানিটি' মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে। তবে, চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনের প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জসমূহ উত্তরণে কেবল রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টাই যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন জাতীয় ঐক্য ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা। চলমান কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন অব্যাহত থাকলে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে, সমুন্নত হবে বিজয়ের চেতনা।

বিজয় দিবসের প্রত্যয় হতে হবে বঙ্গবন্ধু আমাদেরকে যে স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রীয় ভূখণ্ড দিয়ে গেছেন তা রক্ষা করা। মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত শক্তি এখনো দেশবিরোধী ও বঙ্গবন্ধুর পরিবারের ধ্বংসের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। এরা যেন কোনোভাবেই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কাঠামোয় আসতে না পারে সেদিকে আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে। তাই দেশবিরোধী যেকোনো ষড়যন্ত্র বা শক্তিকে কঠোর হস্তে মোকাবিলা করতে হবে। বঙ্গবন্ধুই বলেছেন, "স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে স্বাধীনতা রক্ষা করা কঠিন"। এ থেকে আমরা আমাদের করণীয় নির্ধারণ করতে পারি। এই রক্ষা মানে হচ্ছে দেশের নাগরিকদেরকে দক্ষ, সুশিক্ষিত জনসম্পদে রূপান্তর করা, অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী দেশের সকল মানুষের জন্য স্বাধীনতা অর্থপূর্ণ করে তোলা। এ লক্ষ্যে দুর্নীতিমুক্ত, উদার, গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ উন্নত বাংলাদেশ নির্মাণে সকল নাগরিককে প্রত্যয়দীপ্ত করাই হবে বিজয় দিবসের মর্মকথা।

লক্ষ শহিদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত বাংলাদেশকে আজকের অবস্থানে আসতে অনেক বাধা অতিক্রম করতে হয়েছে। সব বাধা অতিক্রম করে বাংলাদেশ সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আগামী দিনগুলোতে এই এগিয়ে যাওয়া অব্যাহত থাকবে। মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা থেকে বাংলা আর কখনো পিছিয়ে যাবে না। মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করে স্বাধীন বাংলাদেশকে উপহার দিয়েছেন। নতুন প্রজন্মের বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, সাংবাদিকসহ সকল পেশার মানুষকে এখন সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। সেটিই হোক এবারের বিজয় দিবসের প্রত্যয়, প্রত্যাশা ও অঙ্গীকার। ❑

লেখক: সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১৬ই ডিসেম্বর: বাঙালির বিজয়ের...

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পর)

ক্ষমতার উৎস জনগণ', অন্য কেউ নয়।

এই স্বাধীনতার জন্য যে বিশাল মূল্য বাংলাদেশকে দিতে হয়েছিল, তার তুলনা বিশ্ব ইতিহাসে বিরল; ত্রিশ লক্ষ শহিদের প্রাণ ও দুই লক্ষ জননী-জায়া-কন্যার সম্ভ্রম।

১৬ ডিসেম্বর বাঙালি বিজয় অর্জন করলো, স্বাধীনতা পেল। ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু বিজয়ী বাঙালির মধ্যে ফিরে এসে এমন একটি দেশ পেলেন যা ছিল সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত। পরাজয় নিশ্চিত হলে পাকিস্তানিরা অনুসরণ করেছিল 'Scorched Earth' বা 'পোড়ামাটি নীতি'। পশ্চিমা সংবাদ মাধ্যম প্রচার করেছিল বাংলাদেশ যেভাবে বিধ্বস্ত, তার ফলে এক কোটি লোক অনাহারে মারা যাবে। কিন্তু একজন লোকও খাদ্যের অভাবে মারা যায়নি। ভারতে আশ্রয়প্রার্থী এক কোটি শরণার্থীকে পুনর্বাসিত করা হলো। দেশের অভ্যন্তরে কয়েক হাজার কালভার্ট ও বেশ কয়েকটি বড়ো ব্রিজ দ্রুত মেরামত করে যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনরায় চালু করা হয়। দেশের প্রধান বন্দর চট্টগ্রাম বন্দর সম্পূর্ণভাবে অচল ছিল বোমার আঘাতে ডোবা জাহাজের কারণে। সোভিয়েত ইউনিয়নের সাহায্যে বন্দরকে দ্রুত সচল করা হয়। বঙ্গবন্ধু শাসন ক্ষমতায় ছিলেন মাত্র সাড়ে তিন বছর। কিন্তু এরই মধ্যে দেশের মানুষকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি দেওয়ার জন্য কতো কাজ যে তিনি শুরু করেছিলেন, তা ভাবলে অবাক হতে হয়। এর মধ্যে দু'টি বিশেষভাবে উল্লেখ্য; প্রথমটি হলো দেশকে শক্ত রাজনৈতিক ভিত্তিভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্য দশ মাসের মধ্যে একটি অসাধারণ সংবিধান প্রণয়ন (যেখানে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান প্রণয়নে সময় নেওয়া হয়েছিল নয় বছর)। বঙ্গবন্ধু এই সংবিধান ৪ নভেম্বর ১৯৭২ সালে গণপরিষদে উপস্থাপন করার সময় তাঁর ভাষণে বলেছিলেন, "এই সংবিধানই বাঙালির প্রথম সংবিধান"। এই সংবিধানের মাধ্যমেই বাঙালি জনগণকে তার সুদীর্ঘ ইতিহাসে প্রথমবারের মতো রাষ্ট্রের সব ক্ষমতার উৎস হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

দ্বিতীয় পদক্ষেপটি ছিল প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা তৈরি করে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের জনগণকে দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্ত করা। মনে রাখা প্রয়োজন, বঙ্গবন্ধু যে বাংলাদেশ পেয়েছিলেন, তার ৬০ শতাংশ লোকই ছিল দারিদ্র্যসীমার নীচে। তাঁর সাড়ে তিন বছরের শাসনামলে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ যে অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধন করেছিল, তা তার পরবর্তী ৭ বছরেও অর্জন করা সম্ভব হয়নি। তিনি যখন শাসনভার গ্রহণ করেন, সে সময় বাংলাদেশের বাৎসরিক খাদ্যঘাটতি ছিল প্রায় ২০ লক্ষ টন। এই খাদ্যঘাটতি থেকে তিনি দেশকে '৭৫ সালেই প্রায় মুক্তির পথে নিয়ে গিয়েছিলেন। '৭৫ সাল শেষ হওয়ার আগেই বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শী পদক্ষেপের কারণে কৃষিতে বাম্পার ফলন হয়েছিল। কিন্তু এই বাম্পার ফলনের ফলভোগী তিনি হননি। তিনিই সূচনা করেছিলেন ভারতের সঙ্গে সমুদ্রসীমা নির্ধারণ করা ও ছিটমহল বিনিময়। এই সূচনার পরিসমাপ্তি টেনেছেন প্রায় ৪ দশক পরে তাঁরই কন্যা দেশরত্ন শেখ হাসিনা, আর কেউ নয়।

১৯৭৫ থেকে ১৯৯৬ এই দীর্ঘ ২১ বছর বাঙালির পরাজয়ের ইতিহাস। এই ২১ বছরে বাঙালিকে তার মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা অব্যাহত ছিল। এই সময়ে যারা কৈশোর ও যৌবন অতিক্রম করেছে, তারা বাঙালির যে অসাধারণ স্বাধীনতা সংগ্রাম, অসাধারণ আত্মত্যাগ, তা জানতে পারেনি। তখন আমাদের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রিত হতো ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, আইএমএফ ও এডিবির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নির্দেশে। প্রতি বছর বাজেট প্রণয়নের আগে অর্থমন্ত্রীরা ভিক্ষের থলি নিয়ে বেরোতেন ওইসব প্রতিষ্ঠান কতো ঋণ দেবে তার প্রত্যাশায়। আজ কিন্তু আমরা ভিক্ষুক নই। বাংলাদেশের বাজেট আজ আর বৈদেশিক অর্থঋণ ও অর্থসাহায্যের উপর নির্ভরশীল নয়। ১৯৯৬ সালে দেশরত্ন শেখ হাসিনা যখন প্রথমবারের মতো ক্ষমতায় আসীন হন, তখনই তিনি ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ যে অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্য নিয়ে যুদ্ধ করেছিল তাকে পূর্ণতা দেওয়ার জন্য সচেষ্ট হন। এরই ফলস্বরূপ ১৯৯৮ সালে একটি ভয়াবহ বন্যা হওয়া সত্ত্বেও ১৯৯৯-২০০০, ২০০০-২০০১ সালে বাংলাদেশ খাদ্যে প্রায় ৪ দশক পরে প্রথমবারের মতো স্বয়ম্ভর হয়েছিল। কিন্তু এই স্বয়ম্ভরতা ৪ দলীয় ঐক্যজোটের শাসনকালে স্থায়ী হয়নি। প্রথমবারের শাসনামলে দেশরত্ন শেখ হাসিনা কয়েকটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিয়েছিলেন; এর মধ্যে রয়েছে গঙ্গার পানি বন্টন চুক্তি, পার্বত্য শান্তিচুক্তি ও বঙ্গবন্ধুকে নৃশংসভাবে সপরিবারে হত্যাকারীদের বিচারের মুখোমুখি করা। গঙ্গার পানি বন্টন চুক্তির মাধ্যমে তিনি নিশ্চিত করেন, নদীর নিম্নপ্রবাহের দেশের জলপ্রাপ্তির অধিকার। এছাড়াও তাঁর পার্বত্য শান্তিচুক্তি ছিল এমন একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ, যার মাধ্যমে বহু অহেতুক মৃত্যু রোধ করা সম্ভব হয়েছে।

দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পর শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে আজ এক অচিন্তনীয় ও অভূতপূর্ব উন্নয়নের শিখরে নিয়ে গেছেন। ২০০৯ সালে দেশরত্ন শেখ হাসিনা যখন দ্বিতীয়বারের মতো ক্ষমতাসীন হলেন, তখন বিশ্বজুড়ে চলছে গ্রেট রিসেশন বা মহামন্দা। বিশ্বের উন্নত বা উন্নয়নশীল প্রায় সব অর্থনীতির অবস্থাই ছিল সংকটাকীর্ণ। বাংলাদেশের অর্থনীতিও ছিল চরম ভঙ্গুর অবস্থায়। বিদ্যুতের অবস্থা এমনই ভয়াবহ ছিল যে, সন্ধ্যা হলেই ঘরে ঘরে নেমে আসত অন্ধকার। শহর-গ্রাম নির্বিশেষে দিনে-রাতে লোডশেডিং চলত ঘণ্টার পর ঘণ্টা। শিল্প-কারখানাগুলোর অনেকগুলোই বিদ্যুতের অভাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। যেগুলো টিকেছিল, সেগুলোও ধুঁকছিল। এই বিদ্যুৎ সংকটের বড়ো একটি কারণ ছিল, চারদলীয় সরকারের আমলে ১০ হাজার কোটি টাকা খরচ করে বিদ্যুতের খুঁটি আমদানি করা হলেও বিদ্যুৎ উৎপাদন বিন্দুমাত্র বৃদ্ধি করা হয়নি। বরঞ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রায় ছ'শ মেগাওয়াট কমে যায়। বিদ্যুতের এই মহাসংকট থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য দেশরত্ন শেখ হাসিনা এক অসীম সাহসী ভূমিকা গ্রহণ করেন। নানা দেশ থেকে এনে রেন্টাল বিদ্যুৎ প্লান্ট স্থাপন করেন। কারণ, একটি মাঝারি আকারের বিদ্যুৎ প্লান্ট তৈরি করতে সময় লাগে প্রায় ৬/৭ বছর। এই পদক্ষেপের ফলে অনেক এনজিও, অর্থনীতিবিদ প্রমুখ তারস্বরে চিৎকার শুরু করেছিলেন যে শেখ হাসিনা দেশকে মহাবিপদের সম্মুখীন করছেন; কারণ কুইক রেন্টাল প্লান্টে ব্যবহৃত হবে ডিজেল বা ফার্নেস অয়েল, যা দেশকে বিপদের মুখে ঠেলে দেবে, নিঃস্ব করবে। শেখ হাসিনা এদের প্রতিবাদে কর্ণপাত করেননি। তিনি সুদৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যেয়ে মাত্র ৩/৪ বছরের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনকে এমন এক জায়গায় নিয়ে গেলেন, যা কেবলমাত্র ঘরে ঘরে বিদ্যুতই এনে দিল না, দেশকে শক্ত অর্থনৈতিক ভিত্তিভূমির উপরও দাঁড় করিয়ে দিল। এই একই সময়ে পাকিস্তানেরও বিদ্যুৎ ঘাটতি শুরু হয়। কিন্তু পাকিস্তানের নেতারা কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ প্লান্টের আশ্রয় নেয়ার সাহস করেননি। তাই আজ সেখানে বিশাল বিদ্যুৎ ঘাটতির ফলে লাহোর, পেশোয়ার, করাচি, রাওয়ালপিন্ডি, এমনকি রাজধানী ইসলামাবাদ ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিদ্যুৎবিহীন থাকে। ফলে, পাকিস্তানের অর্থনীতি আজ বাংলাদেশ থেকে অনেক পিছিয়ে। বাংলাদেশের বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা আজ ২০ হাজার মেগাওয়াটে পৌছেছে। প্রতিদিন প্রায় ১২ হাজার মেগাওয়াটের বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। ২০০৯ সালে বাংলাদেশের ৪৭ শতাংশ গৃহে বিদ্যুৎ পৌছেছিল, আজ তা ৯৫ শতাংশ। বিদ্যুতের প্রভাবে শহরের অনেক সুবিধাই আজ গ্রামবাসীর দ্বারপ্রান্তে; নিম্নবিত্তের ঘরেও আজ বৈদ্যুতিক পাখা, টেলিভিশন ইত্যাদি পৌছে গেছে। যে বাংলাদেশ বার্ষিক প্রায় ২০ লক্ষ টন খাদ্য আমদানি করত, সেই বাংলাদেশ আজ ২০ লক্ষ টনের বেশি খাদ্যশস্য রপ্তানি করে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদন ছিল ১ কোটি টন, আজ তা ৩ কোটি ৮০ লক্ষ টন, যদিও কৃষিজমির পরিমাণ তখন থেকে অনেক কমেছে গ্রামীণ জমিতে বিভিন্ন ঘরবাড়ি ও ভৌত কাঠামো গড়ে তোলার ফলে। বিপুল বিদ্যুৎ উৎপাদন বাংলাদেশকে আজ একটি শিল্পঋদ্ধ দেশে রূপান্তরিত করছে। ২০০৬ সালে বাংলাদেশের রপ্তানি আয় ছিল ৩.৭ বিলিয়ন ডলার, আজ তা প্রায় ৩৫ বিলিয়ন ডলার। বাংলাদেশ আজ নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ, মাথাপিছু আয় প্রায় ২০০০ ডলারের কাছাকাছি, যা এক দশক আগেও ছিল ৬০০ ডলারের সামান্য উপরে। বাংলাদেশে জিডিপি প্রবৃদ্ধি এই আর্থিক বছরে ৮.১৩। অচিরেই তা ১০ শতাংশে পৌছুবে। এই বছর বিশ্বের যে দশটি অর্থনীতি সবচেয়ে বেশি প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে তার মধ্যে বাংলাদেশের স্থান দ্বিতীয়। দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সারা বিশ্বকে চমৎকৃত ও বিস্মিত করেছে। বাংলাদেশ আজ নিজের অর্থায়নে পদ্মা সেতুর মতো বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ সেতু নির্মাণ করছে, যা তিন বছর আগেও বহু অর্থনীতিবিদ কোনোভাবে সম্ভব নয় ভেবেছিল। বাংলাদেশের অর্থনীতি আজ এতো শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড়িয়েছে যে সে ১১ লক্ষ রোহিঙ্গাকেও আশ্রয় দিতে কুণ্ঠিত হয়নি।

বাংলাদেশ আজ চরম ক্ষুধাকে জয় করেছে, দারিদ্র্যকেও জয় করার প্রান্তে (বাংলাদেশে ২১ শতাংশ লোক এখন দারিদ্র্যসীমার নীচে, যা ৩ দশক আগেও ছিল ৪৭ শতাংশ)। প্রাথমিক-মাধ্যমিক শিক্ষা, নারীশিক্ষা ও নারীজাগরণে আজ বাংলাদেশের অর্জন বিশ্বের কাছে বিস্ময়কর। প্রতি বছর চার কোটি শিক্ষার্থীকে বছরের প্রথমে ৩৫ কোটি বই রাষ্ট্র থেকে বিনামূল্যে প্রদান করা হয়, যা বিশ্ব ইতিহাসেই এক অনন্য ঘটনা। পদ্মা সেতু ছাড়াও অনেক বৃহৎ প্রকল্প রাষ্ট্র আজ নিজের হাতে গ্রহণ করেছে, যেমন, এলএনজি টার্মিনাল, সোনাদিয়া গভীর সমুদ্রবন্দর, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পায়রা সমুদ্রবন্দর, চট্টগ্রাম-কক্সবাজার-টেকনাফ রেললাইন, ঢাকা মেট্রোরেল, কর্ণফুলি টানেল ইত্যাদি। এছাড়াও তৈরি করা হচ্ছে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল, যেখানে হবে অসংখ্য লোকের কর্মসংস্থান।

বাংলাদেশে আজ যে বিশাল কর্মযজ্ঞ চলছে তার লক্ষ্য ১৯৭১ সালে আমরা যে বিজয় অর্জন করেছিলাম, বঙ্গবন্ধু যে সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখেছিলেন, তাকে রূপ দেওয়া, পূর্ণতা দেওয়া। দারিদ্র্যমুক্ত, স্বাস্থ্য-শিক্ষা-সংস্কৃতিঋদ্ধ বাংলাদেশ সৃষ্টি, যেখানে প্রতিটি মানুষ মানুষের মর্যাদা পাবে। সেই বিজয়ের পথেই আমরা এগিয়ে যাচ্ছি, এগিয়ে যাব। ❑

লেখক : শিক্ষাবিদ

প্রথম অতিথি

নির্মলেন্দু গুণ

এরকম বাংলাদেশ কখনো দেখোনি তুমি।
মুহূর্তে সবুজ ঘাস পুড়ে যায়,
ত্রাসের আগুন লেগে লাল হয়ে জ্বলে উঠে চাঁদ।
নরোম নদীর চর হা-করা কবর হয়ে
গ্রাস করে পরম শত্রুকে;
মিত্রকে জয়ের চিহ্ন, পদতলে প্রেম,
ললাটে ধুলোর টিপ এঁকে দেয় মায়ের মতন;
এরকম বাংলাদেশ কখনো দেখোনি তুমি।

নদীর জলের সঙ্গে মানুষের রক্ত মিশে আছে,
হিজল গাছের ছায়া বিপ্লবের সমান বয়সি।
রূপসি নারীর চুল ফুল নয়,
গুচ্ছ গুচ্ছ শোকের প্রতীক,
বাংলাদেশ আজ যেন বাংলাদেশ নয়;
এরকম বাংলাদেশ কখনো দেখোনি তুমি।
কখনো দেখেনি কেউ।

বাতাস বাতাস শুধু নয়,
ত্রিশ লক্ষ মানুষের দীর্ঘশ্বাসময়
আকাশ আকাশ শুধু নয়,
এরকম বাংলাদেশ, বাংলাদেশ নয়।
এখানে প্রাণের মূল্যে
নদীর জলের মধ্যে আসে বান,
টর্নেডো-টাইফুন-ঝড়,
কাল-বৈশাখির দুরন্ত তুফান।

কোকিল কোকিল শুধু নয়,
পাখি শুধু পাখি নয় গাছে,
বাউলের একতারা উরুর অস্থির মতো,
আগ্নেয়াস্ত্রে বারুদের মজ্জা মিশে আছে।

আজকাল গান শুধু গান নয়,
সব গান অভিমান,
প্রাণের চিৎকার বলে ক্রুদ্ধ মনে হয়।
এরকম বাংলাদেশ কখনো দেখেনি কেউ,
তুমি তার প্রথম অতিথি।

যুদ্ধশিশু

কামাল চৌধুরী

মাকে খুঁজছে যুদ্ধশিশু। মা এখনও কুয়াশার মুখ
অভিশপ্ত জন্ম-দাগ মুছে ফেলতে পারে না, তাই
পৃথিবীতে কত সন্তান মাকে খুঁজতে আসে

প্রতিটি যুদ্ধের শেষে রোদ ঠিকই ওঠে, বৃষ্টিও হয়
রক্তের দাগও একদিন শুকায়
অনেক সত্য তবু অপ্রকাশ্য থাকে, থাকতে হয়
মাতৃসদন থেকে বেঁচে যাওয়া কেউ কেউ
দুই যুগ তিন যুগ বহু যুগ পরও
অনেক প্রশ্ন নিয়ে বারবার ফিরে আসে
মায়ের অপমান, লজ্জা মুছে দিতে চায়।

মা হয়তো দূর আকাশে ফুটে থাকা দুঃখিত তারা
হয়তো-বা অন্য কোথাও, পাতার আড়ালে মুখ ঢাকা
এখনও পালাচ্ছে যুদ্ধ-মাতা
সেই ভয়, লোক-লজ্জা, সেই ঘৃণা, সেই পাপ
সন্তানের প্রশ্নের মুখে রক্ত ঝরছে পলাতক পায়ে

দেখা যায় না সেই রক্ত। শুধু, তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে
আত্মপরিচয়
দুই যুগ তিন যুগ বহু যুগ পরও
ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে বঙ্গোপসাগরের তীরে

সেই তীরে অনেক মা, অনেক সন্তান
যুদ্ধশিশুরা তবু কারো সন্তান নয়।